গোয়েন্দা রিপোর্টে ‘রাজনৈতিক সাধু’ ও রামকৃষ্ণ-মিশন

লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

পুনশ্চ

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
GOL PARK KOLKATA-700 029 INDIA
PHONE : (91-33-) 2464-1303 (3 LINES) ; 2465-2531 (2 LINES); 2466-1235 (3 LINES); GRAM : INSTITUTE KOLKATA
FAX : (91-33-) 2464-1307; E.Mail : rmicsl@giascl01.vsnl.net.in; rmic@vsnl.com ; Website : www.sriramakrishna.org

ভূমিকা

পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নানা রকম মতাদর্শের প্রভাব লক্ষ করা যায়। জড়বাদী রাজনীতির মতবাদ এই দেশের বহু স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধাকে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছিল তেমনই হিন্দু ধর্মের সাধু-সন্ন্যাসীদের অধ্যাত্ম চিন্তাও তাদের মনে বিপুল ভাবে সাড়া জাগিয়েছিল। এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ ধারণাটির প্রভাব কতখানি কার্যকর হয়েছিল ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ তা বিচার করবেন। তবে আমরা জানি যে ইংরাজ আমলের অনেক বিদগ্ধ রাজপুরুষ — বিচারক, আমলা, পুলিশ-প্রধান, গভর্নর প্রমুখ সকলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের সাধু-সন্ন্যাসীদের অপরিসীম প্রভাব তথা অবদানের কথা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই এমনও সন্দেহ করেছেন যে সন্ন্যাসীদের মধ্যে একাংশ প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের কাজেও যুক্ত হয়েছিলেন। সরকারের গোয়েন্দা ফাইলের পরিভাষায় এঁদেরই Political Sadhus বা 'রাজনৈতিক সাধু' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছিল।

অধ্যাপক ড. লাডলীমোহন রায়চৌধুরীর আলোচ্য গ্রন্থে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গোপন গোয়েন্দা নথিতে এই সকল তথাকথিত রাজনৈতিক সন্ন্যাসীদের ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করা হয়েছিল তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা দরকার যে সরকারি ফাইলে উল্লেখিত রাজনৈতিক সাধুদের তালিকায় বাংলাদেশের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সমকালীন 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'-এর ভুখা সাধু ও ফকির লুঠেরাদের নামও করা হয়েছিল যদিও সেই অর্থে তাদের কেউই সন্ন্যাসী ছিলেন না। ভারতবর্ষের জীবনধারা এবং হিন্দু ধর্মের সাধু-সন্ন্যাসীদের অধ্যাত্মবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও চেতনার অভাবহেতু বিদেশি রাজপুরুষগণ যে-কোনো ধর্মভাবাপন্ন রাজনৈতিক কর্মীকে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীদের প্রশ্রয়প্রাপ্ত বিপ্লবী বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিগত শতাব্দীর গোড়ায় রামকৃষ্ণ মিশন এবং মিশনের প্রাণ-পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ (Spiritual nationalism) -এ দেশের মানুষের মনে এক তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাই বিধর্মী রাজপ্রতিনিধিগণ মিশনের সন্ন্যাসীদের অনেককেই স্বাধীনতা আন্দোলন তথা রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। 'সিডিশন কমিটি'-র রিপোর্টের (১৯১৮) ২৪ নং অনুচ্ছেদে বিচারপতি রাউলাট শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে শ্রদ্ধাবনত উল্লেখ করা সত্ত্বেও বাংলা দেশের বিপ্লব আন্দোলন যে বহুলাংশে তাঁদেরই চিন্তা-ভাবনার ফসল সে-কথা প্রকারান্তরে ব্যক্ত করেছিলেন— From much evidence before us it is apparent that this influence (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রভাব) was perverted by Barindra and his followers in order to create an atmosphere suitable for the execution of their projects.'

এই বইতে প্রধানত ব্রিটিশ সরকারের ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট, স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের সারণি থেকে পাওয়া তথ্যগুলিই সংকলন করা হয়েছে। সারণিগুলিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা বহু অসংগঠিত সন্ন্যাসী সহ বেশ কয়েকজন আর্য সমাজভুক্ত প্রচারক ও সন্ন্যাসীদের কথাও নথিবদ্ধ করা ছিল। তবে যেহেতু রামকৃষ্ণ মিশনই ছিল সে যুগের সম্ভবত সবচেয়ে সর্বজনপ্রিয় সন্ন্যাসী সংগঠন সেই কারণে ওই সকল গোয়েন্দা দলিলের সবচেয়ে বিস্তৃত পরিসর জুড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের কথাই লেখা হয়েছে। অধ্যাপক রায়চৌধুরী ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান ও ভূমিকা সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে চলেছেন। কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার টেগার্টের লেখা মিশন সম্পর্কিত প্রতিবেদনটি সম্ভবত তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মিশনের ভূমিকা বিষয়ে তিনি বিগত কয়েক বছরে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গোলপার্কে কয়েকবার বক্তৃতাও করেছেন। মিশন বিষয়ে তাঁর অনুসন্ধিৎসার বিশেষ ফসল বর্তমানের আলোচ্য এই গ্রন্থ।

লেখক জানিয়েছেন যে বইটিতে তিনি ইতিহাস গবেষণার আকর উপাদান (Source material) হিসাবেই পেশ করতে চেয়েছেন। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি গোয়েন্দা দলিলগুলির মূল ইংরাজি টেক্সট সহ সেগুলির বঙ্গানুবাদ পাঠকের দরবারে হাজির করেছেন। এই সব দলিলের নিরিখে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর ন্যস্ত করেছেন। তবে তাঁর নিজস্ব মত হল এই যে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে মিশনের সন্ন্যাসীকুল প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও ধর্মপ্রাণ রাজনৈতিক কর্মীদের সম্পর্কে তাঁদের কারো কারো প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির কোনো অভাব ছিল না। অর্থাৎ লেখক বোধহয় এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে মূলত ধর্মীয় এবং অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত হয়েও স্বামী বিবেকানন্দ সহ মিশনের অপরাপর সন্ন্যাসীগণ যদি এ-দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত হয়ে থাকেন তবে সেই চ্যুতি সন্ন্যাসীদের Sublime frailties হিসাবেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। এ বিষয়ে মতদ্বৈধতা থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং লেখকের উপসংহার অধ্যায়ের এই সিদ্ধান্ত কতদূর গ্রহণযোগ্য তা সাধারণ পাঠকেরাই স্থির করবেন।

রামকৃষ্ণ আন্দোলন বিষয়ে পৃথিবীর সর্বত্র গবেষণার কাজ এগিয়ে চলেছে। আমি আশা করি এই গ্রন্থ সেই ধারার একটি মূল্যবান সংযোজন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

স্বামী প্রভানন্দ

কলকাতা
২৭শে ডিসেম্বর, ২০০৫

স্বামী প্রভানন্দ

লেখকের নিবেদন

এই রচনাটিতে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের সাধু-সন্ন্যাসীরা এবং বিশেষত রামকৃষ্ণ মিশন ও মিশনের সন্ন্যাসীসমাজ কীভাবে এবং কতটুকু অংশগ্রহণ করেছিলেন সে-বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান সরকারি নথিতে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এই নথিগুলির মধ্যে টেগার্টের রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ 'পুলিশ রিপোর্টে রামকৃষ্ণ মিশন' ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি ছাড়া বর্তমান রচনায় অন্য যে-সব নথির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি কোনোভাবেই অন্যত্র কোথাও প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য কয়েকটি গবেষণাপত্রে 'রেফারেন্স' হিসাবে এই সকল নথি থেকে ইতস্তত বিচ্ছিন্নভাবে কিছু উদ্ধৃতি প্রয়োগ করা হতে পারে, তবে তা বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হওয়ার নয়।

বর্তমান রচনাতে উল্লিখিত নথিগুলি যথাসম্ভব বঙ্গানুবাদ করে এবং সেই সঙ্গে পরিশিষ্টাংশে এগুলির অধিকাংশেরই মূল ইংরেজি টেক্সট-সহ পাঠকের দরবারে পেশ করা হয়েছে। তবে যেহেতু টেগার্টের রিপোর্টের টেক্সটটি এখন সহজলভ্য, সেই কারণে সেটি এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে।

অনুবাদ-রচনা পাঠে অভ্যস্ত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, মূল রচনার সাবলীলতা অনুবাদিত লেখার মধ্যে প্রায়শই খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রন্থের আলোচ্য লেখাগুলি বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার আমলের রচনা। তখনকার দিনের জটিল বাক্যবিন্যাস (syntax) পদ্ধতি এবং সরকারি আমলাদের ততোধিক জটিল রচনাশৈলী (gobbledegook) ও নথিগুলির পঞ্জিধর্মী (almanac) বর্ণনা প্রভৃতি নানা কারণ পাঠকের প্রাথমিকভাবে কিছু অসুবিধা ঘটাতে পারে। তথাপি এইগুলি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং সেই হিসাবে আলোচ্য বইটির তথ্যসজ্জা (documentation) ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের প্রয়োজন মিটাতে পারে এই ভরসা।

গোলপার্কের 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার'-এর সেক্রেটারি এবং রামকৃষ্ণ আন্দোলন বিষয়ের একাধিক গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর এই লেখা আমার কাছে আশীর্বাণীর মতো। তাঁর কাছে আমি ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ রইলাম।

'বিভাব' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক বন্ধুবর কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর পত্রিকার ১৪১১ বঙ্গাব্দের শরৎকালীন সংখ্যাতে এই লেখাটি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। ব্যয়বহুল এই দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সহযোগিতায় তাঁর কাগজে ছাপা হয়েছিল। শ্রী রাহুল সেনগুপ্ত সেই সময় প্রুফ সংশোধনের গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সুখ্যাত প্রাবন্ধিক এবং ইতিহাস অনুরাগী শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া এই লেখাটি বই করে প্রকাশ করা আদৌ সম্ভব হত না। শ্রীমান অভীপ্সিত ভট্টাচার্য এই লেখার প্রস্তুতি পর্বে আমাকে সাহায্য করেছিল। শ্রীমতী ছবি রায়চৌধুরীর সহযোগিতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ প্রকাশক শ্রী সন্দীপ নায়ক বিশেষ যত্ন নিয়ে বইটি ছাপিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছে আমি ঋণী।

কলকাতা বইমেলা
২০০৬

লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

সূচি

প্রথম অধ্যায়	ঃ	১. গোয়েন্দা রিপোর্টে সন্ন্যাসীসমাজ ঃ স্টিভেন্সন-মুরের রিপোর্ট	১৩
		২. আর্যসমাজ	৪০
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	১. রামকৃষ্ণ মিশন ঃ স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের তিনটি রিপোর্ট	৫১
		২. স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের প্রথম প্রতিবেদন	৫৩
		৩. স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের দ্বিতীয় প্রতিবেদন	৭৩
		৪. স্পেশাল ব্রাঞ্চ ফাইলের তৃতীয় প্রতিবেদন (পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ)	৮৪
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ফাইল ও রামকৃষ্ণ মিশন	৯৫
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	টেগার্টের 'রেড বুক' ও রামকৃষ্ণ মিশন	১১৩
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	উপসংহার	১৬৩

প্রথম অধ্যায়

গোয়েন্দা রিপোর্টে সন্ন্যাসীসমাজ ঃ স্টিভেন্সন-মুরের রিপোর্ট

ভারতবর্ষের বিদেশি শাসনের চেহারাটি ছিল বিশেষ বৈচিত্র্যময়। প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা দেশ (Bengal) থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে এদেশের অন্যান্য অঞ্চলে তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। ইতিহাসে সেই আমলকে কোম্পানির যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়। তারপর ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের (মতান্তরে সিপাহী বিদ্রোহের) শেষে কোম্পানির শাসনের যুগের অবসান হয় এবং কালক্রমে ভারতবর্ষের শাসনভার সরাসরি কুইন ভিক্টোরিয়া তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত হয়। কোম্পানির শাসন ও ব্রিটিশ রাজার শাসন, দুয়ে মিলিয়ে ভারতবর্ষে প্রায় দুশো বছর ধরে বিদেশি শাসন অব্যাহত ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতবাসীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেলেও তার পরাধীন অবস্থার কোনো বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ভারতবাসীরা নিজেরাও বিদেশি শাসক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতেও চায়নি। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল তা বহুদিন যাবৎ কেবল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও শাসক সম্প্রদায়ের নানা ক্ষেত্রে অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রতিকার প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনেই সর্বপ্রথম কংগ্রেসের তরফে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করা হয়েছিল। তার আগে প্রকৃত অর্থে ভারতবর্ষের পরাধীনতার অবসানের জন্য কোনো আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। অবশ্য 'হোমরুল' এবং 'কলোনিয়াল সেল্ফ গভর্নমেণ্ট' জাতীয় নানা দাবি যে উত্থাপিত হয়নি তা নয়, কিন্তু বিদেশি শাসনের নিঃশর্ত অবসান বা পূর্ণ স্বরাজের কথা কখনও বিশেষ উচ্চারিত হয়নি। অন্তত এদেশের মধ্যবিত্ত ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ও পরিচালনাধীন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান ধারায় সেই দাবি ছিল সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, ১৮৫৭-এর অভ্যুত্থানকে এই আন্দোলনের অনেক সুপরিচিত নেতাও অনাবশ্যক আতিশয্য বলে ধিক্কৃত করেছিলেন।

সে-যুগের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে আন্দোলনকারী ভারতবাসীদের পক্ষে এই রকম সাবধানী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়তো একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না এবং এই খামতির জন্য সেই সীমিত-পরিসর আন্দোলনের অনুপম মাহাত্ম্যকে বিন্দুমাত্রও খর্ব করে দেখা চলে না। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে উল্লিখিত প্রধান ধারার রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি; দেশের শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরে যে অগণিত সাধারণ মানুষের বসবাস ছিল, তারা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধাচরণে কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেনি। কোম্পানির আমলের একেবারে গোড়া থেকেই তারা অত্যাচারী বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে লড়াই শুরু করেছিল। হয়তো অনেক সময়েই

তারাও সোচ্চারভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলতে পারেনি। কিন্তু অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ছিল সর্বদাই আপসহীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে বা তারও পরে সচরাচর যেমনটি হত সেভাবে কোনো সর্বভারতীয় নেতার অধীনে এবং একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায়নি। তবু তাদের আন্দোলনের গতি ও তীব্রতা, পরাক্রান্ত বিদেশি শাসকদেরও টনক নাড়িয়ে দিয়েছিল।

কোম্পানির শাসকেরা লক্ষ করেছিলেন যে, এইসব আন্দোলনে সাধু ও সন্ন্যাসীসমাজ অনেক ক্ষেত্রেই রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় গ্রামাঞ্চলের নানা স্থানে যে লুটপাট এবং তথাকথিত অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, সেগুলি বহু ক্ষেত্রেই ভেকধারী সন্ন্যাসীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। এইসব সন্ন্যাসীরা সবাই যে হিন্দুধর্মের সাধনমার্গের উচ্চকোটির মানুষ ছিলেন তা নয়। কিন্তু যেহেতু তাঁরা অনেকেই হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো বেশভূষা পরতেন সেই কারণে তাঁরা গ্রামাঞ্চলে সেই হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং আমাদের দেশের প্রচলিত ইতিহাসে এদের বিদ্রোহকেই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ বলা হয়ে থাকে। এ-ছাড়া ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহেও অনেক ভবঘুরে সাধু-সন্ন্যাসীদের উপস্থিত হতে দেখা গিয়েছিল। আর তারও পরে আর্যসমাজি ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু ও সন্ন্যাসীসমাজও যে ভারতবাসীদের ধর্মীয় তথা জাতীয় চেতনা বহুলাংশে উসকে দিয়েছিল সে-কথা এখন আর কারো অজানা নেই। ধর্মীয় কারণ বা গরিব সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ইত্যাদি যে-কারণেই হোক না কেন মানুষজনের উপর এদের প্রভাবও ছিল অপরিসীম। আর তাই সরকারি কর্তৃপক্ষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে ইংরেজ-বিরোধী এইসব আন্দোলনের মোকাবিলা করতে হলে সর্বপ্রথমেই ভারতের সন্ন্যাসীসমাজকে নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার। কিন্তু কাজটি যে খুব সাবধানে করা দরকার সে-বিষয়ে তাঁরা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কেননা সন্ন্যাসীদের নিয়ে সাধারণ মানুষের আবেগের প্রশ্ন জড়িত থাকে। অতএব তাঁদের রাশ টানবার জন্য এমন কিছু করা উচিত হবে না যার ফলে প্রজাসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। তাই সব দিক গভীরভাবে বিবেচনা করে সরকার সাধুদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ রাজদ্রোহের প্রসার বন্ধ করবার জন্য সরকার যেমন সাধারণ মানুষের গতিবিধি সম্পর্কে নজরদারির ব্যবস্থা করেছিল, তেমনই একই সময়ে, সংসারত্যাগী সাধু সন্ন্যাসীদের উপরেও গভর্নমেন্ট সতর্ক প্রহরা বজায় রাখার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এই কারণে বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই অনেক সময় হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাধু-সন্ন্যাসী সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট প্রস্তুত করা হত। এই রিপোর্টগুলির অধিকাংশই গোয়েন্দা অফিসারদের নির্দেশে রচনা করা হত। এগুলির মধ্যে যে-সব তথ্য এবং সংবাদ পরিবেশন করা হত সেগুলি যে সব অভ্রান্ত বা কতকাংশে অতিরঞ্জিত ছিল না, এমন নয়। গোয়েন্দা রিপোর্টের মধ্যে সাধারণত অতিশয়োক্তি থাকেই। আর ঔপনিবেশিক আমলের পুলিশবাহিনী তো সত্যবাদিতার জন্য কখনোই সুবিদিত ছিল না। কিন্তু এই সব অনিবার্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু মানুষেরা এগুলি একেবারে বাতিল করে দিতে পারেন না, কেননা এইসব রিপোর্ট পাঠ করলে ভারতবর্ষের নিরীহ সন্ন্যাসীসমাজ সম্পর্কে রাজশক্তি যথার্থই কতটা ভীত ছিল এবং তাঁদের সম্পর্কে সরকার কী ধারণা পোষণ করত তার একটা

আভাস পাওয়া যায়। এই সব রিপোর্টের এটাই হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

দিল্লি ও কলকাতার মহাফেজখানা (Archives) এবং পুলিশের বিভিন্ন দপ্তর অনুসন্ধান করে ভারতবর্ষের সাধুসমাজ এবং তাঁদের তথাকথিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ইংরেজ পুলিশের সব চেয়ে পুরোনো কয়েকটি গোয়েন্দা রিপোর্টের সম্প্রতি হদিশ পাওয়া গিয়েছে। এই রিপোর্টগুলি ছিল নানা ধরনের—কোনোটি স্মারক প্রতিবেদন (Memorandum), আবার কোনোটি বা একান্ত গোপনীয় নির্দেশিকা (strictly secret / confidential official circular) হিসাবে ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্তৃপক্ষের দপ্তরে পেশ করা হয়েছিল। এ ছাড়া পুলিশের ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট ও স্পেশাল ব্রাঞ্চের বিভিন্ন গোয়েন্দা ইনস্পেকটারদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যগুলির যে সারণি (Intelligence /Special Branch Abstract) প্রস্তুত করা হত সেইগুলিকেও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের (Bengal) গ্রামাঞ্চলে পুলিশ থানাগুলিতে যে বিপুল পরিমাণ কেস ডায়েরি এবং অপরাধমূলক ঘটনার বিবরণী (Village Criminal Records) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় সেগুলির কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এখানে আরো বলা দরকার যে পুলিশ রিপোর্টগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথ্যগুলি বড়ো এলোমেলো ও অগোছালোভাবে লেখা হয়েছিল এবং সেগুলিতে অনেক সময় একই কথা অনাবশ্যকভাবে বার বার লিখিত হতে দেখা যায়। এই জটিল তথ্যস্তূপের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ খুঁজে পাওয়া বড়ো সহজ কর্ম নয়। তবে আশার কথা এই যে, যে-রিপোর্টগুলি ছাপা হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হত সেগুলি গবেষণার পক্ষে অনেক বেশি সহায়ক বলে মনে হয়। এগুলি সেই আমলের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী এবং প্রশাসনিক আমলা কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, সি. জে. স্টিভেন্সন-মুর (C. J. Stevenson-Moore; Director of Criminal Intelligence), চার্লস অগস্টাস টেগার্ট (C. A. Tegart; Deputy Commissioner of Police, Calcutta), এফ. সি. ড্যালি (F. C. Daly; D. I. G. of Police, Special Branch, Bengal), জি. সি. ডেনহ্যাম (G. C. Denham; Assistant to the D. I. G. of Police, Special Branch, Bengal), সি. জি. ডব্লু. ক্লগস্টন (C. G. W. Clogston; D. I. G. of Police Crime & Railways Madras), এইচ. কানিংহ্যাম (H. Cunningham; Special Branch, Bengal Calcutta) প্রমুখ। এঁরা ছাড়াও গোয়েন্দা বিভাগের যে-সব ভারতীয় ইনস্পেকটার পুলিশ অ্যাবস্ট্র্যাক্টের জন্য প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যথা, প্রমোদ মুখার্জি, নরেন্দ্রকুমার মল্লিক, সমরেন্দ্রনাথ মিত্র, শশিভূষণ দে, ললিতমোহন সেন, এফ. আহ্‌মেদ, এম. হুসেন প্রমুখ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে উল্লেখিত রিপোর্টগুলির মধ্যে দু-একটি ইতিমধ্যেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলেও বেশিরভাগই কিন্তু আজও লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গিয়েছে। এই রকম কয়েকটি এ-যাবৎকাল অপ্রকাশিত নথির বিষয় নিয়েই বর্তমানের এই আলোচনা।

প্রথমেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম গোয়েন্দা রিপোর্টটি নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করা যায়।

এটি ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ সালে সর্বপ্রথম ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটি রচনা করেছিলেন ভারত সরকারের ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স অফিসের অফিসিয়েটিং ডিরেক্টর, সি. জে. স্টিভেন্সন মুর। রিপোর্টটি ছাপা হওয়ার পরে ওই অফিস এটিকে গোপন সার্কুলার হিসাবে চিহ্নিত করে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অবগতির জন্য নানা জায়গায় পাঠিয়ে দেয়। এইভাবে যে মূল রিপোর্টটি বাংলা সরকারের কাছে এসে পৌঁছেছিল সেটি এখন কলকাতার মহাফেজখানায় (West Bengal State Archives) সংরক্ষিত আছে। এই রেকর্ডের ফাইল নম্বর Government of Eastern Bengal and Assam 274/1909. এই গোপন সার্কুলারটির শিরোনাম *Note on Political Sadhus* অর্থাৎ রাজনৈতিক সাধুদের বিষয়ে প্রতিবেদন। এই সার্কুলারটির বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার যে ভারতের বড়োলাট ডাফরিনের (১৮৮৪-৮৮) নির্দেশে এ-দেশের নানা স্থানে ক্রমশ প্রসারিত ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য ১৯০৪ সালে দিল্লিতে যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বা Central Criminal Intelligence Office খোলা হয়েছিল সেই কেন্দ্র থেকেই দেওয়ানি লাভের সময় বা ১৭৬৫ থেকে পরবর্তী প্রায় ১৩০ বছর সময়কালের মধ্যে সাধু ও সন্ন্যাসীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে কীভাবে নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন তার একটি বিবরণী তথা সরকারি ভাষ্য পেশ করা হয়েছিল। রিপোর্টের প্রথম অংশটি হান্টারের লেখা *দি অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল* শীর্ষক গ্রন্থের গোড়ার দিকের যে-অধ্যায়ে বাংলার কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফলের বর্ণনা রয়েছে সেখান থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করা হয়েছিল। হান্টারের বিবরণী-সমেত উপরোক্ত গোয়েন্দা রিপোর্টের যথাসম্ভব বঙ্গানুবাদ (বা adapted Bengali version) এখানে পেশ করা হল।

১৭৭৩ সালে কাউন্সিলের (অর্থাৎ ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী বাংলার গভর্নর জেনারেলকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে চার সদস্যের কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল) লেখা একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সন্ন্যাসী বা ফকির নামধারী একদল আইন ভঙ্গকারী দুর্বৃত্ত (banditti) বাংলা দেশের (Bengal) বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ধর্মীয় তীর্থযাত্রার অছিলায় তারা সেই অঞ্চলের প্রধান প্রধান স্থানে উপস্থিত হয়ে সুযোগ ও সুবিধামতো ভিক্ষা, চুরি এবং লুটতরাজ চালিয়ে যেত। দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পরের বছরগুলিতে বীজ ও উপযুক্ত কৃষি সরঞ্জামের অভাবে যারা চাষের কাজ শুরু করতে পারেনি সেই রকম উপবাসী কৃষকের দল এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৭৭২ সালের শীতের সময় দক্ষিণবঙ্গের আবাদি অঞ্চলগুলিতে হানা দিয়েছিল। এদের দলে ৫০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত মানুষ জমায়েত হয়ে আগুন লাগানো ও লুঠতরাজের কাজে লিপ্ত হত। জেলার কালেক্টরগণ এদের দমন করবার জন্য সৈন্য নামিয়েছিলেন। কিন্তু সাময়িকভাবে এই কাজে সফল হলেও সেনাবাহিনীকেও শেষ অবধি হাল ছেড়ে দিতে হয়েছিল এবং বাহিনীর নেতা ক্যাপ্টেন টমাস এদের আক্রমণের দাপটে একসময় নিজেই তাঁর গোটা সেনাবাহিনী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য শীতের শেষে কোম্পানির

পরিচালকমণ্ডলীর (Board of directors) কাছে এই মর্মে একটি আশ্বাসবার্তা পাঠানো হয়েছিল যে, অন্য আর একজন অভিজ্ঞ সেনাপ্রধানের নেতৃত্বে আর একটি বাহিনী নাকি এদের অচিরেই দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই আশ্বাসবাণীটি যে নিতান্তই অতিরঞ্জিত তা অল্প কিছুদিন পরেই বোঝা গিয়েছিল। অতঃপর ১৭৭৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখের প্রেরিত একটি বার্তায় ওয়ারেন হেস্টিংস খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন যে, ক্যাপ্টেন টমাসের পর যাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল তিনি নিজের চার ব্যাটেলিয়ান সৈন্য কাজে লাগানোর পরেও তাঁর পূর্বসূরির মতো একইরকম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এইসব দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করবার জন্য তিনি স্থানীয় জমিদারদের সাহায্যে একটি অতিরিক্ত বাহিনীও তৈরি করেছিলেন। কিন্তু এদের সম্মিলিত অভিযানও শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। এলাকার স্থানীয় মানুষজন এইসব দুর্বৃত্তদের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় রাজস্ব আদায় করাও সম্ভব হয়নি। বস্তুত বাংলাদেশের (Bengal) তথাকথিত অচঞ্চল জীবনপ্রবাহে এইরকম হানাদারি একটা বাৎসরিক ঘটনার মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৮৫৭-এর বিদ্রোহের আগের যুগেও এই রকম একই ধরনের আরো একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। মিরাটের কমিশনার উইলিয়ামস (Williams) সেই সময় যে-সব ধর্মীয় প্রতিনিধি বা প্রচারকগণ সর্বাধিক পরিচিতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের কথা লিখতে গিয়ে এক জায়গায় মন্তব্য করেছিলেন যে দেশীয় সৈন্যদলকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করার জন্য মিরাট থেকেই সব চেয়ে জোরদার প্রচার শুরু করা হয়েছিল। বন্দুকের কার্তুজে হারামের চর্বি এবং ময়দায় হাড়ের গুঁড়ো মিশেল দেওয়ার কথা চাউর করে এই রকম প্রচার করা হয়েছিল যে সরকার নাকি স্থানীয় মানুষদের ধর্মনাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সেই সময় দেশের সর্বত্র যে-সব পরিব্রাজক ঘুরে বেড়াতেন তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাতির পিঠে চেপে এবং অশ্বারোহী অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে ফকিরের বেশে এপ্রিল মাস নাগাদ মিরাটে এসে হাজির হয়েছিলেন। দেশীয় রেজিমেন্টগুলির মানুষেরা প্রায়শই এঁর কাছে যাতায়াত করছেন দেখে পুলিশের মাধ্যমে তাঁকে ওই এলাকা ছেড়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং বাহ্যত তিনি এই নির্দেশ পালন করেছিলেন বলেও মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে জানা যায় যে তিনি ২০ নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির ধারে কাছে অনেকদিন ধরেই বসবাস করেছিলেন।

চল্লিশ বছর বাদে ওই রকম আরো একটি ঘটনার কথা জানা যায়। ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ বাংলাদেশের (Bengal) পুলিশের সেই সময়কার ইনস্পেকটার-জেনারেল (অধুনা নাইটহুড খেতাবপ্রাপ্ত) ই. আর. হেনরি, সাধু-সন্ন্যাসীরা কীভাবে ধর্মীয় এবং অন্যান্য নানা ধরনের প্রচারকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন সেই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, মাত্র চার পাঁচ বছর আগেও এঁরা এতটা সংগঠিতভাবে কাজ শুরু করতে পারেননি। তিনি বলেন যে গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলনের সময়েই এঁদের কর্মোদ্যম লক্ষ করা গিয়েছিল এবং এই আন্দোলনের সুবাদে নানা স্থানে যেসব হাঙ্গামা ঘটেছিল তার অব্যবহিত প্রাক্কালে এই সকল সাধুদের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতিও চোখে পড়েছিল।

হেনরির অনুসন্ধানের রিপোর্ট একটি স্মারকপত্রের (Memorandum) আকারে ১৮৯৪